তোমায় ভালোবাসি আল্লাহর জন্য

শাহাদাত হুসাইন
শিক্ষক, লেখক, সাহিত্যিক

সম্পাদনা
মাহদী আবদুল হালিম
লেখক, গবেষক, কলামিস্ট

মাকতাবাতুন নূর

প্রকাশকের কথা

'তোমায় ভালোবাসি আল্লাহর জন্য' একটি গল্পগ্রন্থ। এখানে মোট ষোলটি গল্প আছে। প্রতিটি গল্প আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিস্মিত করেছে। লেখক তার মুনশিয়ানায় সমাজের বাস্তবতা তুলে আনতে সচেষ্ট থেকেছেন। প্রতিটি গল্পেরই মূল উপজীব্য হলো ভালোবাসা। এ ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে সমাজের বর্তমান চিত্র ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হয় কেবল আল্লাহর জন্য। এমন ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল বটে। যেখানে ভালোবাসাকে বিভিন্ন উপায় উপকরণে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়, সেখানে ভালোবাসা থাকে না। ভালোবাসা থাকে যেখানে কোনো কিছুর আশ্রয় না নিয়ে কেবলই তাকে হৃদয়ের উষ্ণতায় লালন করা হয়।

ভালোবাসার জাল এখন চারদিকে ছড়ানো। এই জালে খুব সহজেই ফেঁসে যায় যুবক যুবতী। মরীচিকা হয়ে যায় নিঃস্বার্থ ভালোবাসাগুলো। তার পেছন ছুটতে থাকে অবিরাম। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার দেখা হয় না আর। ভালোবাসার নামে সে সব মরীচিকা আর ফাঁদের কথা বলা হয়েছে গল্পগুলোর পরতে পরতে।

মাকতাবাতুন নূর একটি বিশুদ্ধ চেতনা লালনকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সৃজনশীল চিন্তা এবং পরিশুদ্ধ ভাবনা নিয়েই তার পথ চলা। মানুষকে সঠিক উপলব্ধি দিয়ে, সঠিক পথে নিয়ে আসা তার অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা 'তোমায় ভালোবাসি আল্লাহর জন্য' প্রকাশ করতে যাচ্ছি।

শাহাদাত হুসাইন। একজন তরুণ আলেম। একজন উদ্যমী এবং প্রত্যয়ী লেখক। এই প্রথম তিনি মাকতাবাতুন নূরের সাথে কাজ করছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমাদের কাজগুলোকে আখেরাতের নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন
২৪/১/২০২২

লেখকের কথা

ভালোবাসা পানির মতো সরল। কোনো আকার নেই, রং নেই, গন্ধ নেই। যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে। যে রং দেওয়া হয় সেই রং প্রকাশ করে। ফলে মূল ভালোবাসা সরল হলেও পাত্র এবং রংয়ের ভিন্নতায় ভালোবাসা এক গোলক ধাঁধাঁয় পরিণত হয়। প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া বেশ জটিল, কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

'তোমায় ভালোবাসি আল্লাহর জন্য' বইটি পড়লে সেই দুরূহ কাজ অনেকটাই সহজ হবে। কারণ, এই বইয়ে উল্লেখিত ষোলটি গল্প ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন আবহে হলেও প্রত্যেকটি গল্পই আপনাকে জানিয়ে দেবে, প্রকৃত ভালোবাসা কী? কেন একজন মানুষকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে। সরল ভালোবাসার স্বার্থক প্রকাশ যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়– তাই প্রমাণ করতে চেয়েছি প্রতিটি গল্পে।

মাকতাবাতুন নূর-এর স্বত্ত্বাধিকারী মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন একজন আলেম প্রকাশক। অন্য প্রকাশকদের তুলনায় তাই তার চিন্তা একটু ভিন্ন। 'তোমায় ভালোবাসি আল্লাহর জন্য' আমার লেখা হলেও এর মূল ভাবনা তারই। একদিন আমাকে তার ভাবনাগুলো শুনিয়ে বললেন, 'এ বিষয়বস্তুর উপর একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিন আমাকে।'

বিষয়বস্তুর সাথে প্রতিটি গল্পের মেলবন্ধনে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। গল্পগুলো পড়ে তিনি আপ্লুত হন। তার স্বপ্নের স্বার্থকতা খুঁজে পান। তাই বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট এই বইয়ের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা কামনা করি। আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজই আখেরাতের যেন বড় পুঁজি হয়। আখেরাতের সম্বল হয় সেই দোয়া করি।

শাহাদাত হুসাইন
srajudhk@gmail.com

সূচিপত্র

নিবেদন ৯
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা-১ ..... ১৩
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা-২ ..... ২৪
পবিত্র জীবন ৩০
না বলা কথা ৪১
উপেক্ষা ৫৭
বহু বছর পর ৬৫
অসময়ের ভালোবাসা-১ ..... ৭৪
অসময়ের ভালোবাসা-২ ..... ৭৯
অযাচিত প্রেম ৮৪
কুঁড়েঘরে ভালোবাসা ৯৪
উপহারে ভালোবাসা ১০০
প্রবাস প্রেম ১০৫
বিশুদ্ধ পরশ ১০৮
শকুনের চোখ ১১৩
ভালোবাসার ফাঁদ-১ ..... ১২৭
ভালোবাসার ফাঁদ-২ ..... ১৫৩
ভালোবাসা হবে আল্লাহর জন্য ২৬৬

মুচকি হাসিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখনো ভালোবাসা হয়। ভালোবাসার প্রকাশ হয়।

ঐ যে, কুঁড়েঘর! বস্তিতে বসবাস করা লোকগুলো! ঋণের চাপে যারা কোমর সোজা করতে পারে না! মুখ ফুটে ভালোবাসার দুটো কথা বলার মতো যাদের ফুরসত নেই, ফুরসত থাকলেও লজ্জায় আড়ষ্ট জিহ্বা, সন্তানকে পড়াশোনা করানোর মতো যাদের সামর্থ্য নেই, এক ঈদের জামা দিয়ে যারা বহু ঈদ পার করে দেয়, ক্ষুধা মেটানোর জন্য যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার থালা নিয়ে ঘুরে! দেখে এসো! ভালোবাসার সোনার হরিণ তাদের ঘরেই প্রতিপালিত হয়!

প্রিয়! দুটো কথায় কারো কারো ভালোবাসার অনুভূতি লীন হয়ে যায়। জীবনের বাস্তবতায় দীর্ঘ দিন বুকের মাঝে পোষা পাখি মুহূর্তেই পিঞ্জর ছেড়ে উড়াল দেয়। অভাব যখন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা কখনো মলিন হয় না। প্রিয়কে বুকে জড়িয়ে একসাথে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভালোবাসার ভেলায় চড়ে এক অনন্ত সুখের দিকে যাত্রা শুরু করে।

সবকিছুর যথার্থ সময় আছে। অসময়ের কিছুই ভালো হয় না। ভালোবাসারও একটা সময় আছে। অসময়ের ভালোবাসা কেবল দুঃখ বয়ে আনে। ভালোবাসার কোমল ত্বক বিষাক্ত কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। অসময়ের ভালোবাসায় স্বার্থপরতা থাকে। প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি পদক্ষেপই সেখানে স্বার্থ জড়ানো। হয় সে স্বার্থ পার্থিব, নয়তো জেগে ওঠা লালসা মেটানো।

ভালোবাসা মানুষের দুর্বলতা। যে-ই ভালোবাসার মুখোশ পরে তাকেই ভালো মনে হয়। তার প্রতিই বিশ্বাস জন্মে। তার প্রতিই দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ভালোবাসার দুর্বলতাকে পুঁজি করে অমানবিক খেলায় মেতে উঠে কেউ কেউ। সামাজিক সম্পর্কহীন সেই মৌখিক

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা-১

ডাক্তার বলেছে আমি মা হবো। ডাক্তার বলা অবধি চিন্তাও করিনি আমি যে মা হতে যাচ্ছি। আমার মাঝে আরেকটি ব্যক্তিসত্তা অস্তিত্বে আসছে। কীভাবে আমার জীবনে এমন পরিবর্তন হলো, সেটাই এখন রাত দিন ভাবি।

আমার নাম নেহা। আমি প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পড়ি। বয়স বিশ ছুঁইছুঁই। আমার দেহের গড়ন সাধারণ মেয়ের মতো। একটু চিকন আমি। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আমার চেহারা একটু লম্বা। নাকটা সরু। হাসলে দু গালে দুটো টোল পড়ে। নাচ আমার খুব প্রিয়। নৃত্য শিখেছি বেশ ক'জন উস্তাদের কাছে। সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে আমি সবসময় নির্বাচকদের ফার্স্ট চয়েজ। আমার নেতৃত্বে আরো দু চারজন যোগ হতো। আমরা সবাই মিলে পারফর্ম করতাম। একবার স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করতে মেয়েদের টিম লিডার বানানো হয় আমাকে। ছেলেদের টিম লিডার হয় সামি।

সামির সাথে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। স্যার যখন সামির কথা বললো, আমি সামির দিকে তাকালাম। এই সুন্দর ছেলেকে আমি এতদিন দেখিনি কেন, বলতে পারবো না। হয়তো দেখেছি। মনে নেই। ছেলেটা খুব হ্যান্ডসাম। চেহারায় পুরুষালি ভাব স্পষ্ট। চুলগুলো বড়। পেছনে

ঝুটি করেছে। দুকানে দুটো ছোট রিং। হাতে কালো ব্রেসলেট। আমার কাছে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগলো জোড়া ভ্রু। জোড়া ভ্রুর মাঝখানে একটা কালো তিল। আমি সত্যি বেশ অবাক হলাম তাকে দেখে। তাই আমিই আগ বেড়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, "হায়! আমি নেহা।"

মুচকি হেসে হ্যান্ডশেইক করে বললো, "আমি সামি।"

আমাদের দুজনের মাঝখানেই স্যার ছিলেন। দুজনের পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর স্যার বললেন, "আমাদের অনুষ্ঠান হবে আগামী সপ্তাহে। এ এক সপ্তাহের মধ্যে তোমরা দুজন একটা ভালো গান নির্বাচন করে অনুশীলন করে নিবে। কোনো কমতি যেন না থাকে।" স্যারের কথায় আমি বেশ খুশি হলাম। এমন একটা ছেলের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে পারবো।

অনুশীলনের প্রথম দিন আমি তো অবাক। তার পায়ের কারিশমাটা দেখার মতো। আমরা দুজন হলরুমে মোবাইলে গান ছেড়ে নাচ প্র্যাক্টিস করেছি। ভিডিও দেখেছি। আবার নেচেছি। এভাবে বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজেদের প্রায় প্রস্তুত করে নিয়েছি। প্রস্তুতি কেমন হলো জানি না, তবে আমি কেবলই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম সামির মাঝে। সামির সম্পর্কে কিছু না জেনেই কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে অনুষ্ঠানের আগের দিন তাকে নিবেদন করে বসি। একটি লাল টুকটুকে গোলাপ হাতে নিয়ে বলি, "আমি তোমাকে ভালোবাসি সামি, আই লাভ ইউ।"

সামি হকচকিত না হয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো, "আমিও তোমাকে ভালোবাসি নেহা।"

মনে হলো, আমার মতো সেও ভেবে রেখেছিলো। আবেগের কারণে আমি আগে বলেছি আর সে পরে বলেছে। সামির সম্পর্কে আমি জানতাম নম্র-ভদ্র, অভিজাত ঘরের ছেলে। আমাদের সম্পর্ক যখন গভীর সম্পর্কের দিকে যাচ্ছিলো তখনই আমি ভিন্ন সামিকে আবিষ্কার করি। আমার সামনের সহজ সরল সামি আসলে মোটেও সহজ সরল নয়। ভিন্ন একটি জগতের পরিচালক সে। আমি আধুনিক মেয়ে ঠিক কিন্তু গাঁজা,

আমি তখন মনে করতাম, নেশাও বোধ হয় পুলিশের মতো কেউ হবে। যে আমার বাবাকে নিয়ে গেছে। বড় হয়ে যখন সত্যটা জানলাম, তখন থেকেই মাদক আমার চিরশত্রু; যে আমার বাবাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। একদিন জানতে পারি সামি ইয়াবা সেবন করে। সে শুধু সেবনই করে না; বরং ইয়াবার কারবারও আছে তার। অন্যদের কাছে সরবরাহ করে।

আমরা গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছি একদিন। একটা উদ্ভট চেহারার ছেলে এসে বললো, "ভাই, আছে?"

সামি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, "না, নোট বুকটা রাসেলের কাছে।"

ছেলেটা বললো, "আরে বস! নোট বুক কে চাচ্ছে, মাল আছে তোমার কাছে? এক পিস হলেই হবে, এই যে, নগদ টাকা দিব।"

সামি সামনের ও পেছনের পকেট হাতড়ে বললো, "না, নেই।"

ছেলেটা নাছোড়বান্দা। এতিমের মতো হাত ধরে আকুতি জানিয়ে বললো, "জাহিদ ভাইতো বললো, তোমার কাছে নতুন হাফ ডজনের মতো আসছে?"

সামি আমতা আমতা করে কিছু বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট হলো না। যখন দেখলাম আমার সামনে সামির কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তখন আমিই উঠে পড়লাম। বললাম, "আমার উঠতে হবে। তোমরা কথা বলো, বিকেলে আবার দেখা করবো।"

সামি বললো, "ঠিক আছে।"

আমি উঠে ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছি এ সময় শুনলাম পেছনে সামি বলছে, "দেখছিস না, একটা মাল পটাচ্ছি। কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি তোর?"

হাঁটতে হাঁটতেই আমার চোখে পানি চলে এলো। নিজের প্রতি ধিক্কার জানাতে শুরু করলাম। এমন বাজে ছেলের সাথে সম্পর্ক করছি, ভাবতেই

ওসি সাহেব তার প্রস্তুত করা ফাইল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আঙুল দিয়ে আসামিদের নামের তালিকা পড়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। প্রথম নামটি পড়তেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। না, এ হতে পারে না!

বিস্ময় নিয়ে আমি অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললাম, "সামি তো আমার বন্ধু। আমার চোখের সামনেই ওকে এরা মেরেছে। সে কীভাবে প্রধান আসামি হয়!"

অফিসার একটু মুচকি হেসে বললেন, "আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না, আপনি কী কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছেন।" এই বলে তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, "আসুন আমার সাথে!"

অফিসারের পিছনে পিছনে থানার ভেতরের একটি রুমে গেলাম। রুমটা বেশ বড়। এ রুমের শেষ মাথায় একটা লোহার মোটা শিকের গারদ। গারদের ভেতর পাঁচ ছয়টা ছেলে বসে আছে। সবার হাতে হাতকড়া। আমি বাহিরে দাঁড়ালাম। পুলিশ তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। মাথা নিচু করা ছেলেটার মাথার চুল ধরে আমার দিকে তুলে ধরলেন। লাইটের আলো ছেলেটার চেহারায় পড়ছে। অফিসার বললেন, "এ আপনার সামি?"

আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড় বড় চোখ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর যন্ত্রের মতো উত্তর দিয়ে বললাম, "হু, এই তো সামি।"

অফিসার তার মাথা ছেড়ে দিয়ে গারদ থেকে বের হয়ে এলেন। দরজা বন্ধ করে আবার আমাকে নিয়ে বসলেন। আমাকে উদ্দেশ্য করে অনেক কথা বললেন। কিন্তু কোনো কথাই আমার কানে ঢুকলো না। চোখ দিয়ে কেবল অঝোরে পানি ঝরতে লাগলো। একটা কাগজে সাইন করে আমি বের হয়ে এলাম।

* * *

একদিন ডাক্তার আমাকে বললো, 'আপনি প্রেগনেন্ট। আপনার ভেতর বড় হচ্ছে আরেকটি সত্তা।'

আমি অবাক হলাম। ডাক্তারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমার পাশে বসা আকাশ। আমার স্বামী। নামেই আকাশ না। বিশাল মনের অধিকারী সত্যিকারের আকাশ। আমার ভালোবাসার আকাশ। সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে সাহস দিল। বললো, "চলো! বাসায় চলো।"

আমি বোরখার মুখ লাগিয়ে গাড়িতে বসলাম। আমার স্বামী গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা এখন যাবো আমাদের বাসায়। মৌচাক মোড় পার হয়ে গাড়ি আস্তে আস্তে ছুটে চলছে। ভাবছি আকাশের সাথে আমার সংসারের শুরু থেকে।

সেই ঘটনার পর আমার জীবনে পরিবর্তন আসে। আমি হোস্টেল ছেড়ে দেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা শুরু করি। ঘরের বাহিরে বোরখা পরতে শুরু করি। ছেলেদের প্রতি আমি আর তাকাতাম না। নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতাম। আমার পরিবর্তনে আশেপাশের সবাই খুব অবাক হয়েছিলো। অনেকে প্রশংসা করলো আবার অনেকে করলো খারাপ মন্তব্য। কারো কথায় কান না দিয়ে অন্তর থেকে ইসলামকে ভালোবেসে দীনের উপর চলতে শুরু করি।

আমার এরেঞ্জ ম্যারেজ হয়। আকাশ একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতো। প্রথম প্রথম আকাশের প্রতি আমার তেমন ভালোবাসা না থাকলেও আকাশ আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। আমাকে সম্মান করতো। আমি একদিন বললাম, "আমি তো একসময় খারাপ ছিলাম। আমাকে এতো ভালোবাসা দাও কেন তুমি?"

আকাশ বলতো, "ভালোবাসা আসে স্বর্গ থেকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। না এখানে আমার চাওয়া আছে, না তোমার চাওয়া আছে। যেদিন আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে আমার ভালোবাসা ঢেলে দিবেন, সেদিনই তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে, এর আগে নয়।"

রাতে আমরা এক সাথে শুই। গল্প বলা ছাড়া তার আবার ঘুম আসে না। প্রতিরাতে গল্প বলতে হবে। তাও আবার নতুন নতুন গল্প। যেদিন গল্প বলবো না, সেদিন ঘুমাবে না। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে।

একদিন আমি নানুর বাড়ি গিয়েছিলাম। বিকেলেই ফিরবো ভেবেছি। কিন্তু নানা-নানীর পীড়াপীড়িতে থেকে যাই। পরদিনবাসায় এসে শুনি, ভাইটা সারা রাত ঘুমায়নি। আমার জন্য বসেছিলো। শরীরে জ্বর জ্বর ভাব। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেই। আর গল্প বলতে থাকি। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "আমাকে রেখে তুমি নানুর বাসায় গিয়েছ? তুমি তো জানো, আমি তোমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারি না।"

আমি তার মাথায় চুমু এঁকে দিয়ে বলি, পাগল ভাই আমার! সারা জীবন কি আমার সাথে থাকবি? আর তোকে রেখে যেতে আমারও মন চায়নি। কিন্তু আম্মুই তো দিলো না। আর ওদিকে নানা-নানীও কেমন নাছোড়বান্দা। তারা আমাকে আসতেই দিবে না। কী করবো বল? আচ্ছা এখন একটু ঘুমা। এই আমি প্রমিজ করছি তোকে, আর তোকে একা রেখে কোথাও যাব না। একথায় সে আমার হাতে মুখ রেখে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুদল।

বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নিচ্ছি, তখন কেবলই মনে পড়ছে ভাইটার কথা। আমি কালো বলে আমাকে কেউ দেখতে আসে না। অথচ আমার সমবয়সী সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। যারা আসে তারা দাবি করে বিশাল অংকের টাকা। বাবার তেমন টাকাও নেই যে, টাকার বিনিময়ে হলেও আমাকে কারো কাঁধে তুলে দিবে। আমি আমার পরিবারের বোঝা হয়ে আছি। কিন্তু বোঝা হয়ে চিরদিন থাকতে চাই না। হয়তো থাকতে পারতাম,কিন্তু বাবা-মায়ের চোখের পানি আর কত সহ্য করবো?

আমার সামনে তারা চোখের পানি ফেলে না। আমি দেখলে কষ্ট পাবো তাই। আমি তো জানি, ছেলে দেখে যাওয়ার পর যখন কালো বলে আর কোনো কথা বাড়ায় না, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে মা-বাবা ঠিকই চোখের জল

বিসর্জন দেয়। দু'জনের ফোলা ফোলা চোখ তাদের দীর্ঘ কান্নারই যে প্রকাশ, তা তারা না বললেও আমি ঠিকই বুঝে নেই।

সব মেয়েরই একটা স্বপ্ন থাকে। বর্তমানের পথ চলা নির্ভর করে ভবিষ্যতের সেই স্বপ্নের উপর। তার জীবনে খুশির রঙ মেখে একজন পুরুষের আগমন ঘটবে। তাদের সুখি একটা সংসার হবে। ছেলেমেয়ে হবে। দুজনার মাঝে খুনসুটি হবে। স্বামী রাগ করবে। জড়িয়ে ধরে নানা বাহানায় সে রাগ ভাঙাবে। সবাই এক সাথে খেতে বসবে। খাবার নিয়ে হুলুস্থুল হলে বিচারক হয়ে সমাধান করবে।

এমন স্বপ্ন আমারও ছিলো। কিন্তু আমার স্বপ্ন যেন তার পথ ভুলে গেছে। আমার দুহাত ছুড়েও তাকে ধরতে পারি না। মাঝে মধ্যে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই। গভীর দৃষ্টিতে নিজেকে পরখ করি। অন্য মেয়ের যা আছে, তার কী নেই আমার? তাহলে কেন আমার প্রতি এই অবিচার? এই অবজ্ঞা কি শুধু রঙের জন্যই?

একদিন আমি রাগ করে পুরো শরীরে পাউডার মেখে শাদা করে ফেলেছিলাম। কেমন দেখায় শ্বেত বর্ণের হলে দেখার জন্য। কি বিচ্ছিরিই না দেখালো আমায়, আপনাদের আমি বলতেই পারবো না। অথচ এ রঙের জন্যই আজ আমার এ দশা। কালো রঙেই যে আমাকে মানায়, কালো রঙেই যে আমার মাঝে স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, সেটা না কেউ বোঝে, নাইবা কেউ বোঝার চেষ্টা করে। কালোতেও যে সুন্দর হয়, কালোতেও যে সৃষ্টির নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটে, সেটা স্বীকার করতে সবাই নারাজ। অনেকে কালো মেয়েকে হয়তো মানুষ বলতেই নারাজ। মুখে প্রকাশ না করলেও তাদের আচরণ একথাই বলে।

আমার বয়স এখন চব্বিশ। চব্বিশ বছরে কম করে হলেও ত্রিশটা ছেলে আমাকে দেখে গেছে। কিন্তু কেউ পছন্দ করেনি। সবাই আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। জিজ্ঞেস করে না আমি কী করি, আমার কী গুণ! আল্লাহ তাআলার পবিত্র কুরআন যে মুখস্ত করেছি, তাও তাদের মনে কোনো প্রভাব ফেলে না।

"কিসের পানি হবে আর, টিউবওয়েলের পানি!"

"না, টিউবওয়েলের না, এটা হলো শিলার পানি। আজ যখন শিলা পড়েছিলো তখন আমি কুড়িয়ে এর মধ্যে জমা করেছি। দেখ, সে শিলা গলে এখন পানি হয়ে আছে।"

"তাই বল।"

বাবুর জামা খুলতে খুলতে টুনি বললো, "কি করবে তুমি এ পানি দিয়ে?"

"যখন শিলা পড়ছিলো তখন নারায়ণ বলেছিলো, শিলার পানি দিয়ে কপাল ভেজালে নাকি জ্বর কমে যায়। তাই আমি বৃষ্টিতে ভিজে শিলা কুড়িয়ে এ বোতলে জমা করেছি। কেন জানো?"

"না, জানি না। বল, কেন কষ্ট করে জমা করলি?"

"তুমি দেখি কিছুই জানো না। কিছুই বোঝ না। বাবার জন্য। বাবার জন্য কুড়িয়েছি।"

মায়ের দিকে ছোট নিষ্পাপ দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "দেখ আমার হাত। হাতের তালু লাল হয়ে আছে। কেন লাল হয়ে আছে জানো?"

"না, জানি না।"

"ম্যাডাম আমাকে মেরেছে। বৃষ্টিতে ভেজার কারণে স্কেল দিয়ে দুটো বাড়ি দিয়েছে। টুনি ছেলেটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে বললো, "তুমি তোমার বাবাকে অনেক ভালোবাসো, তাই না?"

"খুব বেশি ভালোবাসি। বাবাকে ছাড়া আমার একদম ভালো লাগে না।"

জসিম শোয়া থেকে বললো, "এই! তোমরা কী বকবক করছো? আমার কাছে এসো।"

টুনি বাবুর জামা পাল্টে একটা ছোট লুঙ্গি পরালো। উপরে একটা সেন্টু গেঞ্জি পরিয়ে কোলে করে জসিমের কাছে নিয়ে এলো। বাহিরে আকাশে মেঘের গর্জন চলছেই। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নাই। বাড়িটা আবার

গাছগাছালিতে ছাওয়া। ফলে ঘর অন্ধকার। সে অন্ধকার ক্রমশই গাঢ় অন্ধকারের রুপ নিচ্ছে। জসিম বললো, "হারিকেন জ্বালাও। তোমাদের কারো চেহারাই তো আমি দেখছি না।"

টুনি বললো, "তেল অল্প একটু আছে। রাতের জন্য হবে। এখন শেষ করে ফেললে রাতে অন্ধকারে থাকতে হবে।"

"হু, অন্ধকারেই থাকবো, এখন বাবুর চেহারাটা তো দেখতে দাও!"

টুনি হারিকেন জ্বালিয়ে বাবুর চেহারায় তুলে ধরলো। জসিম বাবুকে নিজের কাছে টেনে কপালে একটা চুমু এঁকে দিল। "কিরে পড়াশোনা কেমন চলছে?"

"ভালো চলছে বাবা।"

"মন দিয়ে পড়াশোনা কর। যখন যা লাগবে বলবি। পড়াশোনায় কখনো কম করবি না, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা,ঠিক আছে।"

জসিম একটা স' মিলে কাজ করে। প্রতিদিন সকালে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে। স' মিলে তার কাজ গাছ চিরা। গাছের ফুট হিসেবে টাকা নিয়ে থাকে। একদিনে ছয় সাত হাজার টাকার কাঠ চিরলেও খালি হাতেই তাকে বাড়ি আসতে হয়। কারণ, মালিকের থেকে টাকা পাবে হাট বারে। যেদিন এলাকার হাট সেদিনই সাধারণত মালিকরা টাকা দিয়ে থাকে।

সপ্তাহে তার মজুরি আটশো টাকা। তাই বেশি টাকা কামাই করলেও সেদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। এই কাজে খুব সতর্ক থাকতে হয়। একটু অমনোযোগী হলেই বিপদ। একই স'মিলে একসময় কাদের আলী ছিল। দু'মাস হলো এ কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কাঠ চিরতে গিয়ে তার ডান হাতের চারটা আঙ্গুল কেটে গেছে। দু'হাতে গাছ জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে গাছটাকে মটর চালিত করাতে চিরছিলো। কাজ করতে করতে অনেক সময় মানুষ নিজের শরীরের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। সেও যখন